জীবনের অনুকরণে

শঙ্করলাল ভট্টাচার্যের গল্প

গল্পের শেষ বাক্যটি লেখা যখন বাকি নিতাই বারিক তখন তাঁর খাতার পাশে ঝরনা কলমটা নামিয়ে রেখে উঠে দাঁড়ালেন। প্রেমের গল্পের শেষ লাইনে নায়কের আত্মহত্যা দিয়ে সহজ সমাধানের পথে পা ফেলতে লজ্জা হল নিতাই বারিকের। আত্মহত্যা জীবনে আকছার ঘটলেও গল্পকাহিনিতে যেভাবে তা দেখানো হয় তাতে নিতাই বারিকের বড়ো একটা সায় নেই। গল্পের পক্ষে বড়ো রোমান্টিক ঘটনা আত্মহত্যা, বড়ো ফুলেল, মধুর পরিণতি।

নাঃ! এভাবে নয়, বলে উঠে পড়লেন নিতাই। তিনি উঠে দাঁড়াতেই টেবিল ল্যাম্পের আলোয় ঈষৎ উদ্ভাসিত ঘরের দেওয়ালে বিশাল একটা ছায়া গড়ে উঠল। নিতাই ভাবলেন, ওই ছায়ার মতন নায়ক সুরেশের আত্মহত্যাটিও একটা অতিকায় অবাস্তব হয়ে ঝুলে থাকবে গল্পের শেষে। অথচ সুরেশকে আমি বেঁচে থাকারও যথেষ্ট পরিবেশ বা অনুপ্রেরণা দিইনি।

নিতাই বারিক একটা সিগারেট ধরিয়ে ঘরের প্রান্তে আধা-ঝুলন্ত বারান্দাটায় গিয়ে দাঁড়ালেন। আর বহুক্ষণ পর তাঁর এই প্রথম মনে পড়ল যে আজ তিনি

বরাকর নদীর পাশে মাঝারি মানের এক ডাকবাংলোয় এসে সাহিত্য করছেন। কলকাতায় তাঁর ফ্ল্যাটেও এমনই আলো-আঁধারি পরিবেশে বসে লেখেন তিনি, কিন্তু সেখানে বারান্দায় এসে দাঁড়ালে এমন উত্তাল হাওয়া নেই, এমন চোখ ধাঁধানো নদীর বিস্তার, চরের বালির চিকচিকি, একফালি চাঁদশোভিত আকাশের ফ্যাকাশে অন্ধকার নেই। ভাবুক হয়ে পড়ার মতন যতটুকু যা দরকার তার সবটাই আছে এই পরিবেশে, শুধু সেই রোমাঞ্চ নেই যা হঠাৎ-হঠাৎ করে এক সময় নিতাইয়ের গল্প উপন্যাসের মোড় ঘুরিয়ে দিত।

লেখা আর আগের মতন সরল স্ফূর্তিতে আসে না নিতাইয়ের কলমে। প্রথম লাইন থেকে শেষ লাইনটি অবধি একটা নিরন্তর কসরত চলে ওঁর ভাষা, টেকনিক, বিষয়, কালি ও কাগজের মধ্যে। যৌবনের উচ্ছ্বাসের টানে পাতার পর পাতা তরতর করে ভরিয়ে চলতেন নিতাই, আর এই ব্যস্ত বিখ্যাত প্রৌঢ়ত্বে সমান প্যাঁচ কষে কষে এগোনোই সার। স্মৃতি হাতড়ে দুটো-চারটে জিনিস হয়তো এখনও খুঁজে পান নিতাই, কিন্তু বাকি সবটাই একটা ক্লান্ত মস্তিষ্কের কল্পনার খেলা। কল্পনাকে খোরাক জোগাতেও নিতাই কখনো পেছপা নন; একটা বাহানায় প্রায়ই কোথাও না কোথাও ঘুরে বেড়িয়ে আসছেন। আজ পাহাড়, কাল নদী, পরশু সমুদ্র—এভাবেই চলছে। কিন্তু বাঁধ বসানো বরাকর নদীর এই স্রোতধারার মতন বহুকাল যাবৎ-ই ওঁর কল্পনাও প্রায় মৃত। দিন দিন টেকনিক সর্বস্ব হয়ে ওঠা ওঁর রচনায় সব চেয়ে বেশি জখম হয়েছে ওঁর কল্পনা। কোনো কাহিনিই তাঁর আর নিজের মতন শেষ হয় না। কোথাও না কোথাও একটা ফন্দির প্রয়োজন হয়, আর সেই ফন্দি অন্যে ধরতে পারুক, না পারুক নিতাইয়ের নিজের কাছে অনবরত একটা পরিহাসের মতন ধরা দেয়।

রোমান্টিক গল্পের ডাকসাইটে লেখক নিতাই বারিকের কাছে এরকম একটা আধুনিক ফন্দি হল আত্মহত্যা। নায়ক কিংবা নায়িকার এহেন একটা মৃত্যুর

পর অতিরিক্ত প্রশ্নের জবাব দেওয়ার দায়ভার থেকে অব্যাহতি পান নিতাই। পাঠকের চোখে জল, বুকে বেদনার সঞ্চার হলেও নিতাইয়ের নিজের মধ্যে প্রায়শই একটা অক্ষমতা জনিত পাপবোধ থেকে যায়। ইদানীং তাই নিজের গল্পের মুদ্রিত চেহারার দিকে চোখ ফেরাতেও অনীহা জাগে ওঁর। প্রায়ই রাতে স্ত্রী সবিতার পাশে শুয়ে শুয়ে ভাবেন, হায়! কী জীবন। এই মহিলাটির প্রতি ভালোবাসা আর নিজের লেখালেখির প্রতি আকর্ষণ সবই যেন একই সঙ্গে নিঃশেষ হয়ে গেল। এ সমস্ত ভাবনা মাথায় জড়ো হলে নিতাই উঠে ফ্ল্যাটের বারান্দায় এসে দাঁড়ান আর নীচে ফুটপাথে টান টান হয়ে শুয়ে ঘুমিয়ে থাকা, ঠেলাওয়ালা, বিচালিওয়ালাদের দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে ভাবেন, ওদের এই ঘুমের মধ্যে যে স্বতঃস্ফূর্ত জীবন আছে তা আমার জীবনের কোনো কিছুতেই নেই। যখন আমি জেগে থাকি তখনও আমার চেয়ে বেশি মৃত কেউ নয়।

বাংলোর বারান্দা থেকে নিতাই বারিক ওঁর সিগারেটটা ছুড়ে ফেললেন বরাকরের জলে। কিছুদূর অবধি অন্ধকারে সিগারেটের আগুনটাকে ছুটে যেতে দেখা গেল, তারপর সবই ফের পূর্বের মতন নীরব এবং অন্ধকার। নিতাইয়ের বুক ভেদ করে একটা দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে এল, যার ম্লান আওয়াজ ওঁর কানে গিয়ে ধাক্কা দিল। নিতাই চিন্তা করার চেষ্টা করলেন—কী এমন অসংগতি ওঁর জীবনে যে নিজের কোনো অভিজ্ঞতাকেই তিনি আর আগের মতন বিশ্বাস করতে, বিশ্বাসযোগ্যভাবে লিখে উঠতে পারেন না। উপরন্তু তিনি যা কিছুই স্মৃতি থেকে লেখার প্রয়াস করেন তাতেই যেন কোত্থেকে কিছুটা অবাস্তবতা এসে মিশে যায় এক সময়। কিছুকাল আগে সবিতাকে নিয়ে একটা গল্প লিখতে গিয়েও ঠিক এই সমস্যা উপস্থিত হল। কিছুটা লেখার পরেই চোখ বুলোতে গিয়ে ওঁর মনে হল সবিতা কখনোই এভাবে এসব কথা কাউকে বলে না। মিথ্যে অভিমান সবিতার মধ্যে একেবারেই নেই, এবং সবিতা কোনোদিনই একলা একলা ঘরে বসে স্বগতোক্তি করার লোকই না। নিজের সংশয় দূর করতে নিতাই লেখাটা একবার সবিতাকে পড়তে দিলেন,

অথচ নায়িকা সুচিত্রার সঙ্গে একটি জায়গাতেও সবিতা নিজের কিছুমাত্র সাদৃশ্য খুঁজে পেল না। পেলে অন্তত একবার সে-কথা বলত সবিতা। স্বামীর লেখায় নিজের প্রতিফলন দেখলে সেটা চিনে ফেলতে সবিতার কিছুমাত্র দেরি হত না। কিন্তু বহুদিন হয়ে গেল ওকে নিয়ে সম্ভবত নিতাই লেখা বন্ধ করে দিয়েছেন। সবিতা এমন কথা ভেবে থাকলেও নিতাই জানেন কত অসংখ্যবার ইদানীং তিনি ক্রমাগত সবিতাকে ভেবে ভেবে তাঁর নায়িকাদের চিত্রিত, চরিত্রায়িত করেছেন, কিন্তু প্রতিবারই কিছুদূর এগিয়েই খেয়াল হয়েছে কল্পনার নারীটি আসলে কল্পনাই থেকে গেছে, সবিতার জীবন থেকে কোনো সত্য তাতে গিয়ে মেশেনি। শেষমেশ নিতাই প্রায় ধরেই নিয়েছেন যে সাক্ষাৎ বাস্তবকে কখনো সাহিত্যে মূর্ত করা সম্ভব নয়। অন্তত তাঁর পক্ষে কখনোই সম্ভব না। অথচ নিতাইয়ের মনের গভীরে যে চিন্তাটি ক্রমাগত খচখচ করে উঠছিল সেটিকে কিছুতেই মেনে নিতে ওঁর সাহসে কুলোল না। বাইশ বছর টানা ঘর করেও সবিতাকে যে তিনি তেমন গভীরভাবে চিনে উঠতে পারেননি এই সরল সত্যটুকুকে কিঞ্চিৎ প্রশ্রয় দিতেও নিতাইয়ের অহমিকায় বাঁধে। এর পরবর্তী সংলগ্ন সত্যটি আরও ভয়ংকর বলে নিতাই অতদূর অবধি কখনোই ভাবেন না, ভাবার অভ্যাসই নেই। সবিতার জন্যই যে সুরেশ বিষ খেয়েছিল এই চিন্তাকে এই বাইশ বছর ধরে মনের এক অন্ধকার কুঠুরিতে বন্দি রেখেও যে সেটিকে মারতে পারেননি নিতাই সেজন্য নিজেকে ছাড়া আর কাউকে ধন্যবাদ দেবার নেই। সবিতা এতদিনে একটিবারও সুরেশের নামোচ্চারণ করেনি, এমন কোনো প্রসঙ্গও এতদিনে ওঠেনি যাতে কিছুক্ষণের জন্যও সুরেশকে আলোচনা করা যায়। আরও বড়ো কথা, পুরো বাইশ বছর ধরে নিজের এক গুণমুগ্ধ, উচ্ছাসী পাঠককে কীভাবে যে ভুলে থাকার সচেতন প্রচেষ্টা চালিয়ে গেছেন নিতাই তা যে-কোনো মনস্তত্ত্ববিদকে স্তম্ভিত করতে পারে। নিতাইয়ের গল্প উপন্যাসকে যদি পরোক্ষভাবে কোনো কিছু প্রভাবিত করে থেকে থাকে তবে তা হল সুরেশের স্মৃতি, সুরেশের আত্মহত্যা। এক

বাস্তববাদী লেখক থেকে নিতাইয়ের জটিল, রোমান্টিক লেখকে রূপান্তরের নির্ভুল কারণও ওই স্মৃতি, ওই আত্মহত্যা।

আর এই বাইশ বছর পর এক মৃত, বাইশ বছরের তরুণকে স্বজ্ঞানে নায়ক করে গল্প লিখতে গিয়েও নিতাই দেখছেন যে বাস্তবের ঘটনা আর শিল্পের যুক্তি সব সময় হাত ধরাধরি করে চলে না। যদি সত্য ঘটনা দিয়ে এই গল্পের শেষ করতে হয় তবে সুরেশকে ঘুমের বড়িগুলো একসঙ্গে জলের গেলাসে ফেলে গুলে নিয়ে এক ঢেকে গিলে ফেলতে হবে সমস্ত জলটা। কিন্তু নিতাইয়ের মনে হচ্ছে এই বাস্তব ঘটনাটাই কাহিনির একমাত্র ফন্দি, রোমান্টিক নিউসেন্স হয়ে প্রতিভাত হবে। যোগ্য সমাপ্তি হয় যদি সুরেশ তাঁর প্রেয়সীর বাড়িতে ছুটে যায়, গিয়ে দেখে সদ্য বিবাহিত সবিতা বিয়ের বেশে উজ্জ্বল হয়ে মুখে এক মিথ্যা বেদনার ভাব নিয়ে ঘরের এক কোণে বসে আছে। সুরেশ ওর হাতের বাণ্ডিলটা সজোরে রাখবে খাটের পাশে। লাল ফিতেতে বাঁধা ওই বাণ্ডিলে সুরেশকে লেখা সবিতার যাবতীয় প্রেমপত্র। সুরেশ কিছু বলার আগে ওকে দেখে চমকে উঠবে সবিতা, তুমি!!

-কেন, খুব দেরি করে ফেললাম কি?

–কেন, কেন এলে সুরেশ? আর তো কিছু হবার নেই, শোনা তুমি চলে যাও প্লিজ!

আমি চাই না আজ তোমাকে কেউ অপমান করুক। প্লিজ সুরেশ!

সুরেশ ওর পাঞ্জাবির পকেট থেকে এক সোনার হার বার করবে আর বলবে, আমার স্বর্গতা মা এই হারটি রেখে গিয়েছিলেন তাঁর ভাবী পুত্রবধূর জন্য। এই চিঠি আর এই হার তুমি রেখে দাও সবিতা। এ-চিঠি তুমি পুড়িয়ে ফেলো, কিন্তু এই হার বছরের কোনো একটি দিন পোয়রা। তাহলে আমার আত্মা

শান্তি পাবে। আমি জানি নিতাইদা সংকীর্ণমনা নন, তিনি এইটুকু আকাঙ্ক্ষায় আমার বাদ সাধবেন না।

তখন সবিতা উঠে এসে চেপে ধরবে সুরেশের হাত। মুখে বলবে, তুমি আমায় ক্ষমা করো সুরেশ। এই বিয়ে কিন্তু আমি চাইনি। দাও, তোমার নিজের হাতে পরিয়ে দাও তোমার হার। আমি পরব।

সুরেশ সবিতার গলায় হারটা পরিয়ে দিয়ে পিছনে আংটা লাগাতে গিয়ে অনুভব করল ওর হাত হারের থেকে সরে এসে গেঁথে বসছে সবিতার গলায়। সবিতার শ্বাসরোধ হলেও গলা দিয়ে কোনো স্বর বেরুতে পারছে না। যন্ত্রণায় ছটফট করছে ওর মুখ, ওর শরীর, আর ওর নাক দিয়ে গলগল করে গড়িয়ে পড়ছে রক্ত। সুরেশ বুঝতে পারছে সবিতা মারা যাবে, কিন্তু কিছুতেই নিজের হাত দুটোকে ফিরিয়ে আনতে পারছে না। সুরেশের নিজের মুখ দিয়ে অস্ফুটস্বরে শুধু বেরুল, আমি তোমায় ভালবাসি সবিতা। পরমুহূর্তে দ্বিগুণ শক্তিতে ওর হাত গেঁথে যেতে লাগল সবিতার গলায়। সুরেশ ভাবল, কী আশ্চর্য! প্রেম আর ঘৃণা কত নিকট আত্মীয়। কী সুখের সহবাস ওদের।

নিতাই বারিক বাংলোর বারান্দা ছেড়ে এসে নিজের লেখার টেবিলে ফের বসলেন। বাস্তবের আত্মহত্যা কিংবা এই মুহূর্তের কল্পনার হত্যা কোনোটিকে তাঁর যথেষ্ট সাহিত্যিক পরিণতি বলে মনে হল না। ওঁর সেই পুরোনো ধারণাটাই বেশ দানা বেঁধে উঠছে মনে জীবনকে অনুসরণ করে সাহিত্য করা যায় না। জীবন সত্যিই খুব অতিনাটকীয়। নাহলে যে সুরেশ তার বান্ধবীকে এনে পরিচয় করাল প্রিয় লেখক নিতাই বারিকের সঙ্গে পাকেচক্রে সেই মেয়েরই ফটো নিয়ে ঘটক একদিন হাজির হল নিতাইয়ের কাছে। আর বলল, নিতাইবাবু, আপনার মাকে বলে এসেছি আপনার ব্রহ্মচর্য এবার ভঙ্গ করবই। এমনই চমৎকার কন্যার সন্ধান এনেছি এবার। একবারটি এই ফটো দেখুন

আর এই সব বলতে বলতে মানিব্যাগ থেকে বার করে আনল ছোট্ট পাসপোর্ট সাইজ ছবি। সবিতার। প্রথমে নিতাই হাসবেন না কাঁদবেন ভেবে উঠতে পারছিলেন না, তারপর প্রচন্ড এক চোট হাসিতে ফেটে পড়লেন তিনি। আর হাসতে হাসতেই বললেন, আরে! এ মেয়েকে তো আমি চিনি। সবিতা দে। আমার এক ভক্তের গার্লফ্রেণ্ড। কী যে সব করেন আপনারা! আমি তো মাকে বলেইছি আমি বিয়ে করব না। তাও কেন যে আপনারা লেগে আছেন। বলিহারি আপনাদের বাপু!

ঘটক এবার কান চুলকোতে চুলকোতে বলল, কী বললেন? কার গার্লফ্রেণ্ড যেন? নিতাই বেশ জোরের সঙ্গে তাকে নিরস্ত করে বললেন, আমার এক তরুণ ভক্ত পাঠকের। নাম সুরেশ মিত্র।

এবার একটা তাচ্ছিল্যের হাসি হেসে ঘটক বলল, হুঁ! গার্লফ্রেণ্ড! আপনি কি ভাবছেন সে খবর আমি নিইনি! ওই যে সুরেশ না কি বললেন, ওর খবরও আমি নিয়েছি। ছাত্র ভালো ছিল, অঙ্ক না ভূগোলে এম এ পাস। কিন্তু যত রকমের বায়বীয় নেশা আছে সব কটিতে সিদ্ধহস্ত বাবু। গাঁজা, আফিং, ঘুমের বড়ি সব। তার ওপর আবার কবিতা-টবিতা লেখে। আর ওই ছেলের কি কখনো বিবাহ হয়? খাওয়াবে কী? নিজেই বা খাবে কী? না, না ওসব খবরটবর সব নেওয়া আছে আমার। এবার আপনি শুধু একটা ছোট্ট করে ‘হ্যাঁ’ বলুন।

নিতাই বেশ ঝাঁঝের সঙ্গে বললেন, না না, এ হতে পারে না। আমাদের পরিচিত কারও বান্ধবীর সঙ্গে আমার বিয়ে হতে পারে না। বিশেষত মেয়েটিকেও যখন অত ভালো চিনি। আমার সঙ্গে বয়সেরও ঢের ফারাক, আপনি দয়া করে এ ব্যাপারে এগোবেন না।

ঘটক চলে যেতে বাস্তববাদী লেখক নিতাই তাঁর জীবনের প্রথম যথার্থ রোমান্টিক গল্পটি লিখলেন। নায়ক সুরেশ, নায়িকা সবিতা, ভিলেন নিতাই নিজে। গল্পে নামগুলো আলাদা হয়ে গেলেও সেটিতে ছাপাতে দিতে অহমিকায় বাঁধল নিতাইয়ের। একটা গোপন জেলাসি ততক্ষণে শুরু হয়ে গেছে সুরেশের প্রতি, আর এক দৃপ্ত, সুপ্ত কামনা সবিতাকে পাওয়ার জন্য। রাতে একতলায় খেতে যাওয়ার সময় পড়পড় করে ছিঁড়ে ফেললেন গল্পটি নিতাই এবং ভাতের প্রথম গ্রাসটি মুখে তুলতে তুলতে মাকে বললেন, মা আজ যে সম্বন্ধটা এনেছিল ঘটক তুমি সে-ব্যাপারে ইচ্ছে করলে খোঁজখবর নিতে পারো। রোজ এসে ঘ্যানঘ্যান করে লোকটা, এবার ঝামেলা চুকিয়ে দাও।

এর ক-দিন পর সুরেশকে এক দীর্ঘ চিঠি লিখেছিলেন নিতাই আর সেই সঙ্গে পাঠিয়ে দিয়েছিলেন নিজের সদ্য প্রকাশিত উপন্যাস ‘পিছুটান’। সুরেশ তার কোনো উত্তর দেয়নি বা প্রাপ্তিস্বীকারও করেননি। তখন নিরুপায়, লজ্জিত নিতাই একটি দীর্ঘ চিঠি লিখেছিলেন সবিতাকে। তাতে তিনি সবিতাকে অনুরোধ করেছিলেন বাড়ির চাপে পড়ে সে যেন তাঁর সঙ্গে বিবাহে মত না দেয়। যদিও সবিতাকে বিয়ে করতে পারলে তিনি খুবই খুশি হবেন। বিয়ের কিছুকাল পরই নিতাই জানতে পারেন যে সে-চিঠি বাড়ির লোকেরা সবিতার হাতে পৌঁছোতে দেয়নি।

আর আজ এতকাল পর জীবনের প্রথম রোমান্টিক গল্পটিকে নতুন করে লিখতে গিয়ে নিতাই বুঝলেন যে, তাঁর কল্পনা শুকিয়ে গেছে আর জীবনের বাস্তব অভিজ্ঞতাগুলো অতিনাটকীয়, যুক্তিহীন হয়ে পড়ছে। তার মনে হল, সুরেশই তার অদৃশ্য হাত দিয়ে নিতাইয়ের জীবনকাহিনি লিখে যাচ্ছে। অলৌকিক এক প্রভাব বিস্তার করে নিয়মিতভাবে তার প্রতিশোধ নিয়ে যাচ্ছে। নিতাই তাঁর গল্পের পৃষ্ঠাগুলি দামচা করে নিক্ষেপ করলেন ওয়েস্ট পেপার ব্যাগে। তারপর নতুন কয়েক শিট কাগজ নিয়ে একটা চিঠি লিখতে

শুরু করলেন সবিতাকে। লিখলেন, গত বাইশ বছর ধরে সমানে ভেবে এসেছি একদিন সুরেশের কথা লিখব, কিন্তু সে আর হল না। একেক সময় ভাবি হয়তো সুরেশই অদৃশ্য হাতে লিখে যাচ্ছে তোমার আর আমার জীবন। যেভাবে অদৃশ্য থেকেও সে তোমার ওপর তার সমস্ত দাবি খাঁটিয়ে যাচ্ছে। একথা তোমার অজানা নয়, আমিই শুধু বোকার মতন এর থেকে মুখ ফিরিয়ে থাকার চেষ্টা করেছি। কিন্তু পারলাম কই?

তুমি যে সুরেশকে কতখানি স্মরণ করো তা আমি বুঝি। কারণ তুমি ভুলেও ওর নাম করো না। যা নিয়ে তুমি সবসময় কথা বলো, সবসময় মেতে থাকো আসলে সেগুলিই কোনো দাগ ফেলে না তোমার মনের ওপর। এ আমি জানি। সুরেশকে ভুলিনি বলে সুরেশকে নিয়ে লিখতেও পারিনি। আর এতদিন পর যখন চেষ্টাও করলাম দেখছি সেই নীরবতা ভঙ্গ হবার নয়। এক অতিনাটকীয় মৃত্যু বেছে নিয়ে সুরেশ আমার গল্পকাহিনিরও সীমানা পেরিয়ে চলে গেছে। সাহিত্য দিয়ে তাকে অনুসরণ করা অসম্ভব। ওর আত্মহত্যার যোগ্য প্রতিফলন হত আজ এই রাতে, এই গভীর রোমান্টিক পরিবেশে আমি যদি একমুঠো ঘুমের বড়ি জলে গুলে খেয়ে নিতে পারতাম। কিন্তু তাও হবার নয়। কারণ সাহিত্য করতে করতে বুঝেছি জীবনও সাহিত্যের কতকগুলো নিয়মনীতি মেনে চলে। বাইশ বছর বয়সের তরুণের আত্মহত্যা রোমান্টিক ঘটনা হলেও চুয়াল্ল বছর বয়সি কোনো প্রতিষ্ঠিত ব্যক্তিত্বের আত্মহত্যা অযথা স্ক্যাণ্ডেলের বেশি কিছু না। আমি সেই অপমানের বোঝা কখনো তোমার ওপর চাপাব না। তবু এসব কথা তোমাকে না লিখেও পারছি না। কারণ আমি গত কয়েক বছর ধরেই একটু একটু করে অনুভব করে এসেছি যে, আমার সাহিত্যজীবন ফুরিয়ে গেছে। অনুপ্রেরণার সেই স্বচ্ছ, নির্বাধ ধারাটি শুকিয়ে কাঠ হয়ে আছে। এই আমার যথার্থ মৃত্যু। কিছুকাল আগে তুমি অনুযোগ করে বলেছিলে, তুমি কেন আত্মজীবনী লেখো না? তখন আমি কী বলেছিলাম? বলেছিলাম, রসো, রসো, আগে গল্পটল্প লেখার দিন শেষ হোক।

যখন কিছুই আর লেখার থাকবে না তখন আত্মজীবনী লিখতে বসব। লিখব, নির্মমভাবে, কল্পনার কোনোরকম আশ্রয় নিয়ে। আজ মনে হচ্ছে সেই লেখাও আর হবার নয়। সুরেশের প্রসঙ্গ বাদ দিয়ে নিজের কথা কী লিখব? আর সুরেশের কথা ভাবলে নিজেকে আর ততটা সমীহ করার মতন মানুষ বলে মনে হয় না। অন্তত যতটা সমীহ করলে নিজের জীবনকাহিনি লেখা যায়।

চিঠি শেষ করে নিতাই সেটিকে খামে ভরে ফেললেন, তারপর সেই খাম নিজের পাঞ্জাবির পকেটে রাখলেন। ফের একটা সিগারেট ধরিয়ে বারান্দায় বেরিয়ে এলেন। দেখলেন দূরে সেতুর উপর দিয়ে দীর্ঘ কনভয় যাচ্ছে লরির। তাদের হেডলাইটের আলোয় সেতুর একটা অংশ সাদা হয়ে আছে। আজ সকালে ওই বিধ্বস্ত সেতুর উপর হাঁটতে গিয়ে নিতাইয়ের মনে হয়েছিল গভীর রাতে এর ওপর দিয়ে জলে ঝাঁপ দিলে সেটা কেমন হবে? বাঁধ কিংবা সেতুর উপর দাঁড়ালে প্রায়শই আজকাল এই চিন্তাটা হয় নিতাইয়ের। আর এখন এই দূর থেকে সেতুটির ওই আংশিক আলোকিত রূপ দেখে নিতাইয়ের মনে হলো, সবটাই নির্ভর করে কে আত্মহত্যা করছে, কেন করছে তার ওপর। আত্মহত্যার পরিবেশটাই সবসময় বড়ো ব্যাপার নয়।

আর এভাবে হঠাৎ নিজেকে আত্মহত্যারও অযোগ্য জ্ঞান হতেই নিতাই বারিকের মনটা ভয়ানক এক বিষণ্ণতায় ভরে গেল। ওঁর একটা কান্নার প্রবণতা হল। যেভাবে তিনি কদাচ তাঁর নায়কদের কাঁদতে দেন না। ভাবেন সেটা অতিনাটকীয় হবে।